#আমি পদ্মজা পর্ব ৫৬

_____

সুষ্ঠুভাবে হেমলতার মৃত্যুবার্ষিকীর মিলাদ সম্পন্ন হয়। বিকেলে মোড়ল পরিবারের সদস্যরা একসাথে আটপাড়ার মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাথে বৃদ্ধা মনজুরা এবং হিমেল রয়েছে। মসজিদের কবরস্থানে পাশাপাশি শুয়ে আছেন মোর্শেদ,হেমলতা ও পারিজা। কবরের কাছে আসা নিষেধ বলে মেয়েরা দূর থেকে দুই চোখ ভরে তিনটি কবর দেখছে এবং চোখের জল বিসর্জন দিচ্ছে। মৃত্যুর এতোগুলি বছর পেরিয়ে গেছে তবুও কবরের সামনে এসে দাঁড়ালে বুকে এতো কষ্ট হয়! কাছের মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ভয়ানক বিষের নাম। এই বিষ যারা পান করেছে তারাই জানে কষ্টের মাত্রা। পূর্ণা ছিঁচকাঁদুনে। সে চোখের জলে স্নান করছে। পদ্মজা ছলছল

চোখে তাকিয়ে আছে কবরগুলোর দিকে। মা নামক মমতাময়ী মানুষটার ছায়ার অভাববোধ প্রতিটি পদক্ষেপে সহ্য করতে হয় । কত ভালোবাসতেন তিনি। মাথার উপর তার ছায়া ছাড়া নিঃশ্বাস নেওয়া দায় ছিল। আর আজ এতো বছর ধরে পদ্মজা দিব্যি এই মানুষটাকে ছাড়াই বেঁচে আছে। জন্মদাতা পিতা ছোট থেকে অনেক লাঞ্ছনা-বঞ্চনা করেছে। কত আকুল হয়ে থাকত পদ্মজা, পিতার ভালোবাসা পেতে। যখন ভালোবাসা পেল বেশিদিন পৃথিবীতে রইলেন না । মা মরা মেয়েদের রেখে নিজেও পাড়ি জমালেন ওপারে। তারপর পদ্মজার কোল আলো করে এলো কন্যা পারিজা। পিতা-মাতার মৃত্যুর শোক কিছুটা হলেও লাঘব হয়। কিন্তু এই সুখও বেশিদিন টিকেনি। খুব কম আয়ুকাল নিয়েই জন্মেছিল পারিজা। পদ্মজাকে আঁধারের গহীনে ছুঁড়ে ফেলে এক এক করে চলে যায় সুখতারারা।

পদ্মজা বেশিক্ষণ দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি বুকের ভেতর চেপে রাখতে পারেনি। সে মুখ এক হাতে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে। বাসন্তী পদ্মজার মাথাটা পরম যত্নে নিজের কাঁধে রাখেন। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন,'কেঁদো না মা। একদিন দেখা হবে। হাশরের ময়দানে।'

_____

সময় তার নিজের গতিতে চলে। কারো জন্য থেমে থাকে না। কেটে যায় আরো তিনটা দিন। এর মাঝে পূর্ণা মৃদুলের সাথে শুটিং দেখতে গিয়েছে একবার। গ্রামের পথে দুজন হেসেখেলে কথা বলেছে। এতেই কানাঘুষা শুরু হয়েছে। এদিকে আমিরের ভীষণ জ্বর। শুকিয়ে গেছে অনেক। ভেতরে ভেতরে কী যেন ভাবে সারাক্ষণ। খাওয়া দাওয়াও কমে গেছে। সবসময় চিন্তিত থাকে। বাড়িতে বেশিক্ষণ

থাকে না। এদিকওদিক ঘুরে বেড়ায়। এখন শুয়ে আছে বারান্দার ঘরে। পদ্মজা কপালে জলপট্টি দিচ্ছে। আমিরের চোখ দুটি বন্ধ। পদ্মজা আদুরে গলায় ডাকল,'শুনছেন?'
আমির চোখ বন্ধ রেখেই বলল,'হু?'
'কী এতো ভাবেন?'
আমির চোখ খুলে পদ্মজার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটি ভয়ংকর লাল। রাতে না ঘুমানোর ফল। সে পদ্মজাকে পাল্টা প্রশ্ন করল,'কী ভাবব?'
'জানি না। কিছু তো ভাবেনই। চোখ দুটি তার প্রমাণ। আপনি কোনো কিছু নিয়ে কি ভীতিগ্রস্ত?'
আমির বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। বলল,'তেমন কিছু না।'
'যেমন,কিছুই হউক। বলুন না আমাকে।'
'আমাদের ঢাকা ফেরা উচিত।'

‘হঠাৎ? ‘
‘জানি না কিছু। আমার প্রায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে আজেবাজে স্বপ্ন দেখে। তোমাকে হারাতে পারব না আমি।’
‘আমার কিছু হবে না। আমি কারো কোনো ক্ষতি করিনি যে-

পদ্মজা থেমে গেল। সে তো একজনকে খুন করেছে! পদ্মজার দৃষ্টি এলোমেলো হয়ে আসে। আমির পদ্মজার দিকে চেয়ে বলল,’তুমি কী করে কাউকে খুন করতে পারলে! আমি ভাবতেই পারি না। এরপর থেকেই ভয়টা বেড়ে গেছে। আমার খুব চিন্তা হয়। ঘুম হয় না। রাত জেগে পাহারা দেই কেউ যেন আমার পদ্মবতীকে ছুঁতে না পারে।’
পদ্মজার দুই চোখ জলে ভরে উঠে। বলে,’প্রথম তো বিশ্বাস করেননি,এটাই ভালো ছিল। এখন তো বিশ্বাস করে চিন্তায় পড়ে গেছেন। আর

অসুস্থ হয়েও পড়েছেন।’
‘আমি ভেবেছিলাম,স্বপ্ন দেখেছো। তাই ঘুম থেকে উঠে আবোলতাবোল বলছো। তারপর সুস্থ-স্বাভাবিক ভাবেও যখন বললে,অবিশ্বাস কী করে করি?’
‘এতো ভালোবাসতে নেই। আমার কপালে সয় না।’
‘ভালোবাসতে না করছো?’
‘মোটেও না। মাত্রা কমাতে বলছি।’

———————

পাশেই অজয়বাবুর আম বাগান। সাঁ সাঁ করে শীতল হাওয়া বইছে। পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে। পূর্ণা মৃদুলের চেয়ে পাঁচ-ছয় হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মস্তক নত। ওড়না বেসামাল হয়ে উড়ছে। মগাকে দিয়ে পূর্ণাকে ডেকে এনেছে মৃদুল। আসার পর থেকেই ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণা। দাঁত দিয়ে নখ

কাটছে। মৃদুল নিরবতা ভেঙে বলল,
‘আমি আগামীকাল বাড়িত যাইতেছি।’
পূর্ণা চকিতে তাকাল। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে প্রশ্ন করল,’কেন?’
মৃদুল মুচকি হেসে বলল,’নিজের বাড়িত কেন যায় মানুষ? এইহানে তো বেড়াইতে আইছিলাম।’
‘ওহ।’
পূর্ণা মৃদুলের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। কান্না পাচ্ছে তার। মৃদুল এক ধ্যানে পূর্ণার দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বলল,’অন্যদিকে চাইয়া রইছো কেন? এদিকে চাও।’

পূর্ণা বাধ্যের মতো মৃদুলের কথা শুনে। তার দুইচোখে জল টলমল করছে। পূর্ণার মেঘাচ্ছন্ন দুটি চোখ দেখে মৃদুলের ভীষণ কষ্ট অনুভব

হয়। সে কেমন একটা ঘোর নিয়ে জানতে চাইল,’চলে যাব,শুইনা কষ্ট হইতাছে?’
পূর্ণা আবারও দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। অভিমানী স্বরে বলল,’মোটেও না। চলে যান।’
‘দুইদিন পরই আসতাছি।’
পূর্ণার চোখেমুখে হাসির ছটা খেলে যায়। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দুই কদম এগিয়ে এসে বলল,’সত্যি?’
‘সত্যি। এবার হাত ধরি?’
মৃদুলের বেশরম আবদারে পূর্ণা লজ্জা পেল। সে দুই কদম পিছিয়ে যায়। দুই হাত পিছনে লুকিয়ে ঠোঁটে হাসি রেখে বলল,’বাড়ি থেকে আসার পর।’
পূর্ণা দৌড়ে পালায়। মৃদুল পিছনে ডাকে,’এই কই যাও।’
চঞ্চল পূর্ণা না থেমে ফিরে তাকায়। তার লম্বাকেশ হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে উড়ছে। সে

মিষ্টি করে হেসে জবাব দিল,’বাড়ি যাই। আপনি সাবধানে যাবেন। জলদি ফিরবেন।’

মৃদুল তার গোলাপি ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে হেসে মাথা চুলকাল। কী অপূর্ব দেখাচ্ছে গ্রামের চঞ্চল শ্যামবর্ণের মেয়েটিকে। হাওয়ার তালে মেঠো পথ ধরে ছুটে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। চুল আর ওড়না দুটোই হাওয়ার ছন্দে সুর তুলে যেন উড়ছে।

———————

সকাল সকাল মগা এসে খবর দিল,রানি মদনের মাথায় আঘাত করেছে। মদন এখন হাসপাতালে ভর্তি। খলিল হাওলাদার রানিকে মেরে আধমরা করে একটা ঘরে বন্দি করে রেখেছেন। এ কথা শুনে পদ্মজা অস্থির হয়ে পড়ে। খলিল হাওলাদার এতোই জঘন্য যে, পদ্মজার মনে হয় এই মানুষটা নিজের মেয়েকে যেকোনো মুহূর্তে খুন করে ফেলতে

পারে। পদ্মজা আমিরকে চাপ দেয়,ওই বাড়িতে নিয়ে যেতে। নয়তো সে একাই চলে যাবে। একপ্রকার জোর করেই আমিরকে নিয়ে আসে হাওলাদার বাড়িতে।হাওলাদার বাড়ির পরিবেশ থমথমে, নির্জন। সবসময়ই এমন থাকে। এ আর নতুন কি! অন্দরমহলে ঢুকতেই আমিনা আমিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আকুতি-মিনতি করে বলে,'বাপ,আমার মেয়েরে আমার কাছে আইননা দেও। নাইলে,ওর কাছে আমারে লইয়া যাও। তোমার দুইডা পায়ে ধরি।'
আমির আমিনাকে মেঝে থেকে তুলে আশ্বাস দেয়,'আমি দেখছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'
আমির খলিলের ঘরের দিকে যায়। ফরিনা এসে বিস্তারিত বললেন,'রাইতের বেলা মদনের চিল্লানি হুনি। দৌড়ে সবাই আইয়া দেহি মদন পইড়া আছে। মাথা দিয়া কী যে রক্ত বাইর হইতাছে। আর রানির হাতে এত্ত বড় একটা ইট। ছেড়িডারে দেইখা মনে

হইতাছিল,ছেড়িডার উপরে জ্বীনে আছর করছে। আরেকটু অইলে এতিম ছেড়াডা মইরা যাইত। বাবুর বাপ আর রিদওয়ান মেইলা তাড়াতাড়ি হাসপাতাল লইয়া গেছে। আর এইহানদে তোমার চাচা শ্বশুরে রানিরে মাইরা ভর্তা কইরা লাইছে। নাক মুখ দিয়া রক্ত ছুটছে। তবুও থামে নাই। আমরা অনেক চেষ্টা করছিলাম তোমার চাচাশ্বশুরের হাত থাইকা বাঁচাইতে,পারি নাই। আলোডা কি যে কান্দা কানছে! এহন ঘুমাইতাছে।”

আমির চাবি নিয়ে আসে। আমিনা সাথে যেতে চাইলে আমির বলল,’আমি আর পদ্ম যাচ্ছি। রানিরে নিচে নিয়ে আসি। পদ্ম আসো।’

পদ্মজা ছুটে যায় আমিরের পিছু পিছু। ঘরের দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই রানি তাকায়। রুম্পা যে ঘরে ছিল সেই ঘরেই তাকে রাখা হয়েছে। রানি কাঁদছিল। দরজা খোলার শব্দ শুনে থেমে

যায়। বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখমুখের রক্ত শুকিয়ে গেছে।
আমির,পদ্মজাকে দেখে রানি দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। কাউকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে নিজের জীবন নিয়ে সুখী না। পৃথিবীর সব কষ্ট যেন তার বুকে। এসব মারধোর আর গায়ে লাগে না। বাপের কথায় বাড়ির কামলা বিয়ে করল। এটা তার জন্য কতোটা অপমানের কেউ বুঝবে না। সে শুধু মানুষ ভেবেই বাড়ির কামলাকে স্বামী মানতে পারেনি। এতোটা উদার সে নয়। সে মানে সে ভালো না। বাপের জোরাজুরিতে নাতনিও দিল। তারপর থেকেই মদন পেয়ে বসে। কারণেঅকারণে তাকে ছুঁতে চায়। মদনের একেকটা ছোঁয়া রানির জন্য কতোটা বেদনাদায়ক তাও কেউ জানবে না। গতকাল রাতে মদন জোরদবস্তি করেছিল তাই রানি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।
খালি ড্রামের নিচে থাকা ইট নিয়ে চোখ বন্ধ

করে মদনের মাথায় আঘাত করে। এতে সে এখন মোটেও অনুতপ্ত না। পদ্মজা রানির মনের অবস্থা একটু হলেও বুঝতে পারছে। মেয়েটা হাসিখুশি থাকার জন্য বাচ্চাদের সাথে কাবাডি,গোল্লাছুট, কানামাছি কত কী খেলে! তবুও সুখী হতে পারে না। পদ্মজা সাবধানে রানির পাশে এসে বসল। বলল,'খুব মেরেছে?'
রানি পদ্মজার দিকে তাকিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে বলল,'তুমি জাইননা কী করবা? মলম লাগাইয়া দেওন ছাড়া আর কী করনের আছে?'
আমির কিছু বলতে উদ্যত হয়। পদ্মজা আটকে দেয়। সে চমৎকার করে হেসে রানিকে বলল,'মলম লাগানোর মানুষই বা কয়জনের ভাগ্যে জুটে আপা?'

রানির দৃষ্টি শীতল হয়ে আসে। এই মেয়েটার সাথে রাগ দেখানো যায় না।
পদ্মজার মাঝে অদ্ভুত কিছু আছে। যা রাগ

দমন করতে পারে। রানি বলল,'আমি...আমি ভালা নাই পদ্মজা। আমি একটু আরাম চাই। সুখ চাই। আর কষ্টের বোঝা টানতে পারতাছি না।' রানির কথার ধরণ এলোমেলো। সে অন্য এক জগতে আছে। বন্দি পাখির মতো ছটফট করছে। মুক্তির আশায় ডানা ঝাঁপটাচ্ছে। পদ্মজার খুব মায়া হয়। ভীষণ অসহায় লাগে। ভালোবাসার মানুষ জীবনে এসে আবার হারিয়ে গিয়ে এভাবেই জীবন এলোমেলো করে দেয়। এতো যাতনা কেন প্রেমে? যার শূন্যতা আজও শান্তি দিল না রানিকে। প্রতিনিয়ত কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। রানির ভেতরটা যে একেবারে শূন্য। সে পিরিতের যন্ত্রনায় আজও কাতর! আচ্ছা,যদি রানিকে তার উপযুক্ত কোনো ছেলের সাথে বিয়ে দেয়া হতো তবে কী সে তার ভালোবাসাকে ভুলতে পেরে একটু সুখী হতে পারত?

আমির,পদ্মজা ধরে ধরে রানিকে নিচ তলায় নিয়ে আসে। সবাই কত কী প্রশ্ন করে। রানি নিশ্চুপ। কারোর কোনো কথার উত্তর দেয়নি। সবাই যত্ন আত্তি করে। আমিনা খাইয়ে দেন। পুরো দিন রানি বিছানায় শুয়ে থাকে। আমিনা সারাদিন চেষ্টা করেছেন রানি যাতে কথা বলে। কিন্তু রানি যেন পণ করেছে,কথা না বলার। অন্যদিকে মদন ভালো আছে। কয়দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে। সেলাই লেগেছে। গঞ্জের হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল এরপর সেখান থেকে শহরে। এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে। রানিকে সবাই অনেক খারাপ কথা বলছে। অভিশাপ দিচ্ছে। অনেকে বাড়ি বয়ে এসে কটু কথা বলে গেছে। বাড়ির কেউ নিষেধ করেনি। রানি চুপ করে শুনেছে। বাড়ির অবস্থার কথা ভেবে আমির মোড়ল বাড়িতে ফেরার কথা বলেনি। দিনশেষে রাত আসে। সুন্দর পৃথিবীকে জাপটে ধরে ঘোর অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে হারিয়ে যায় রানি। সকালে চিঠি পাওয়া যায়। তাতে লেখা- “আমার আলোরে দেইখা রাইখো তোমরা।”

চলবে...